Journal of ELT and Education
p-ISSN: 2618-1290, e-ISSN: 2663-1482
OPEN ACCESS

Volume 9, Issue 1, 2026, Page: 19-23
Center for Academic Research and Development (CARD)

Original Article

আবুল ফজলের ছোটগল্প: ব্যঙ্গরসের অন্তরালে গভীর সমাজদর্শন

মোঃ তুহিন হাসান*

সারসংক্ষেপ: আবুল ফজল একজন মানবতন্ত্রী কথাসাহিত্যিক। তিনি জীবন ও শিল্পের মাঝে কোন বিভাজন রেখা তৈরি করেননি। যার প্রমান রয়েছে তাঁর পাঁচটি গল্পগ্রন্থের প্রায় পঞ্চাশটি ছোটগল্পে। গল্পগুলোতে তিনি জীবনকে বাস্তবতার আলোকে সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে চিত্রিত করেছেন। অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান সমাজের আত্মোন্নয়ন ও অগ্রগতি তথা জাগরণের কামনা থেকেই তিনি গল্পগুলো রচনা করেছেন। বাংলার মুসলমান সমাজের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কারাছন্ন জীবন, ধর্মীয় ভণ্ডামি, আচারসর্বস্ব ধর্ম পালন, মনোজগতের নানা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াকে তিনি ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে গল্পগুলোয় তুলে ধরেছেন। আর এই ব্যঙ্গরসের অন্তরালে সর্বদা ক্রিয়াশীল থেকেছে তাঁর গভীর সমাজদর্শন। গল্পগুলোয় ব্যঙ্গরসের অন্তরালে থাকা লেখকের গভীর সমাজদর্শন অনুসন্ধানে সংযুক্ত হয়েছে পাঠ নির্ভর আলোচনা ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ।

মূলশব্দ: ব্যঙ্গরস, সমাজদর্শন, মুসলমান সমাজ, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ভণ্ডামি, জাগরণ

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) বাংলা সাহিত্যে একজন খ্যাতিমান যুক্তিনিষ্ঠ প্রাবন্ধিক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত হলেও কথাসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাস রচনার পাশাপাশি ছোটগল্প রচনায়ও তিনি পারদর্শী। বাংলার মুসলমান সমাজ সমস্ত সীমাবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা অতিক্রম করে একটি শিক্ষিত কুসংস্কারমুক্ত উন্নত জাতি হিসেবে যেন আত্মপ্রকাশ করতে পারে সেই লক্ষ্যে তিনি ছোটগল্প রচনা করেছেন। আর সেক্ষেত্রে মুসলমান সমাজের অসঙ্গতি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস প্রভৃতিকে আঘাত করার জন্য ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকে কৌশল হিসেবে অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলোতে ব্যবহার করেছেন। এই ব্যঙ্গরসের অন্তরালে সর্বদা সক্রিয় থেকেছে তাঁর সমাজদর্শন। যার অন্যতম কারণ তিনি কেবল শিল্পের জন্য শিল্পচর্চা করেননি, বরং জীবনের জন্য শিল্পচর্চা করেছেন। তিনি কেবল লেখার প্রয়োজনে গল্প লেখেননি। আর তাই তাঁর ছোটগল্প সম্পর্কে লেখক নিজেই বলেছেন:

> "আমার অন্যান্য লেখার মতো এ লেখাগুলিতেও আমাদের সামাজিক বিবর্তনের কিছুটা ছায়াপাত ঘটেছে এবং কোন কোন গল্পে তা গল্পের চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে। শুধু গল্পের খাতিরে গল্প আমি খুব বেশি লিখিনি। সাহিত্যের যে এক বিশেষ সামাজিক ভূমিকা আছে গোড়া থেকেই এ ধারণা আমার বদ্ধমূল" (হোসেন, ১৯৮৮: ১৭০)।

১৯২৬ সালে ঢাকায় মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যা পরবর্তীকালে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। এই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে আবুল ফজলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তাঁর সাহিত্যিক মানস ও চেতনালোকে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রভাব অপরিসীম। এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করা, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও পর্বত সমান কুসংস্কার-অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করা, আধুনিক শিক্ষা তথা জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করা। ত্রিশের দশকের শুরুতে আবুল ফজল মুসলিম সাহিত্য সমাজের সম্পাদক হন। তিনি পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজের জাগরণের জন্য যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ রচনা করেন। একই উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কিছু উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনা করেন। তাঁর গল্পগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটি। সেগুলো হলো: 'মাটির পৃথিবী' (১৯৪০), 'আয়ষা' (১৯৫১), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৬৪), 'নির্বাচিত গল্প' (১৯৭৮), 'মৃতের আত্মহত্যা' (১৯৮০)। তাঁর গল্পের সংখ্যা প্রায় ৫০টি এবং অধিকাংশ গল্পের প্রকাশকাল বিশ, ত্রিশ ও চল্লিশের দশক। তিনি ছোটগল্পের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজের বিভিন্ন সঙ্কট ও জীবন বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছেন। এ সম্পর্কে সমালোচক সরিফা সালোয়া ডিনার এই মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

> "জনজীবনের সার্থক রূপকার আবুল ফজলের গল্প বিষয়বৈচিত্র্যে অনন্য। তাঁর গল্পে সমাজজীবনের নানাবিধ সমস্যা যেমন, ধর্মীয় কুসংস্কার-গোঁড়ামি-পশ্চাৎপদতা, দাম্পত্য জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত-প্রেম, জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তথা মানব মনের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচন-প্রয়াস প্রভৃতি বিষয়রূপে সন্নিবিষ্ট হয়েছে" (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য, ২০০৯: ১৭২)।

আর এই সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি তাঁর ছোটগল্পগুলোর মধ্যে অনেক স্থানেই ব্যঙ্গরসের আশ্রয় নিয়েছেন। এ সম্পর্কে গবেষক বোরহান মাহবুবের এই মন্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

Corresponding email: tuhin.bangla@bmu.edu.bd
*প্রভাষক (বাংলা), বাংলাদেশ মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি

Citation: হাসান, মোঃ তুহিন (২০২৬)। আবুল ফজলের ছোটগল্প: ব্যঙ্গরসের অন্তরালে গভীর সমাজদর্শন। *জার্ণাল অব ইএলটি এন্ড এডুকেশন*, ৯(১), ১৯-২৩। https://doi.org/10.5281/zenodo.18671580

Copyright © *JEE, CARD, Hello-Teen, Dhaka, Bangladesh & Author(s)*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

"যুক্তিনিষ্ঠ মানবতাবাদী চিন্তাবিদ হিসেবে খ্যাত হলেও আবুল ফজলের সৃষ্টিশীল সাহিত্যের পরিমাণও কম নয়। প্রখর সমাজসচেতন সাহিত্যসাধক হিসেবে তিনি সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে মুখ্যত বাঙালি মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ও পশ্চাৎপদতাসহ নানারকম অসঙ্গতিকে তুলে ধরেছেন, তৎপর হয়েছেন সেগুলো থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধানে। আবুল ফজল নিপুণ তীরন্দাজের মতো সমাজের অজ্ঞতা, কুসংস্কার এবং কূপমণ্ডূকতাকে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে আঘাত করেছেন; জাগিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন মানুষের অপসৃয়মান বিবেককে" (মাহবুব, ২০১২: ৮১)।

আবুল ফজলের কথাসাহিত্যে তাঁর চারপাশের জগৎ ও জীবন উপস্থাপিত হয়েছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সহকারে বা তির্যকভাবে। গবেষক আজহার ইসলামের মন্তব্যেও এ কথার সত্যতা মেলে:

"আবুল ফজল সেই বাসনার বশবর্তী হয়ে তাঁর সৃষ্টিকে কেবল যে সাধারণ্যে প্রবেশাধিকারের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছেন তা-ই নয়, তিনি তাঁর সৃষ্টিকে সত্যের রূপে এবং সত্যকে সুন্দরের আনন্দময় ভাবমূর্তিতে উপস্থাপিত করার প্রেরণা অনুভব করেছেন। কথাশিল্পী আবুল ফজলের এই অনৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর চারপাশের জীবন এবং জগৎকে উপস্থাপিত করেছে তীর্যক রেখায়" (ইসলাম, ২০২১: ৯৬)।

আবুল ফজলের ছোটগল্পে ব্যঙ্গরসের অন্তরালে তাঁর সমাজদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে সমালোচক চঞ্চল কুমার বোসের এই মত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য:

"আবুল ফজলের স্কেচধর্মী ফর্মে রচিত জয়, জনক, সংস্কারক, লাঠৌষধ প্রভৃতি গল্পে তাঁর তীব্র সমাজজিজ্ঞাসা ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। আবুল ফজলের ভাষা ও রচনাশৈলীর বর্ণনায় মাঝে মাঝে কাব্যিক উদ্ভাসন ও অন্তিম বক্রোক্তিতে একটি অবাধ ভাসমানতা আছে; কিন্তু প্রত্যেকটি লেখার মধ্যেই যে রহস্যপ্রিয় হাস্যরসাত্মক খোলামেলা আবহ পাওয়া যায় তা রসোপলব্ধির অভ্রান্ত উদ্দীপক" (বোস, ২০০৯: ৩১)।

ছোটগল্পে ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে আবুল ফজলের যে সমাজদর্শনের পরিচয় মেলে সে সম্পর্কে সমালোচক সরিফা সালোয়া ডিনার এই মন্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ:

"আবুল ফজলের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ আয়যা প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ বঙ্গাব্দে। এটি মাটির পৃথিবী গ্রন্থের নয়টি এবং নতুন চারটি গল্পের সংকলন। এই গ্রন্থে সংযোজিত নতুন চারটি গল্প যথাক্রমে 'নিজের মা পরের বাপ', 'উচ্চ ও তুচ্ছ', 'প্রিয়ার চেয়ে প্রিয়' ও 'তিনবার'। এ গল্পগুলোতে সামাজিক সমস্যার গূঢ়তম দিক ভাবগম্ভীরতা, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ ও স্যাটায়ারের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে" (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য, ২০০৯: ১৭৪)।

'জয়' গল্পে শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে লেখক আমাদের সমাজের ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও অন্তঃসারশূন্যতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। এই গল্পের গ্রাজুয়েট সিরাজের পিতা একজন হাজী। যিনি মসজিদে নামাজ পড়ান এবং ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে নানা জ্ঞান প্রদান করেন। প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজের শেষে তিনি সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, সুদ দেওয়া-নেওয়া হারাম সহ বিভিন্ন বিষয়ে মানুষকে অবগত করেন। অথচ তিনি নিজের প্রয়োজনে সুদে টাকা ধার নেন। সুদে তিনি কেবল তার নিজের জন্যই টাকা ধার নেননি বরং মসজিদ নির্মাণের কাজেও সুদের টাকা ব্যবহার করেছেন:

"মসজিদ পাকা করিবার সময় তিনি যে হাজার তিনেক টাকা সুদে কর্জ লইয়াছিলেন তাহা এখনো পরিশোধ হয় নাই। তারপর যখন নন্-কো'র সময় তরুণদের হাতে তাঁহার নেতৃত্ব ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তিনি পাঁচশত টাকা খেলাফাতে চাঁদা দিয়া জেলা খেলাফৎ কমিটির সভাপতি-পদ রক্ষা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই টাকাও আসিয়াছিল মহাজনের লোহার সিন্দুক হইতে" (ফজল, ২০১০: ৬৫)।

তার মুখের কথা এবং কাজের মধ্যকার বৈসাদৃশ্যকে লেখক নিপুণভাবে এই গল্পে তুলে ধরেছেন। তার এই বৈসাদৃশ্যমূলক আচরণ ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের সমাজে এরূপ ধর্মচর্চাকারী ব্যক্তিদের অভাব নেই। গল্পের এক পর্যায়ে দেখা যায় তিনি নিজের পুত্র সিরাজের বিয়ের জন্য কড়া সুদে পাঁচ হাজার টাকা ধার নিয়েছেন। তবে এই সঙ্কট আরো প্রকট হয়েছে যখন শিয়া-সুন্নির বিভেদের কারণে সিরাজের পিতা তার পুত্রকে বিয়ে না দিয়ে বরযাত্রীসহ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে ধর্মের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। অথচ তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় ইসলামের সাম্য তথা মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই সহ নানা বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছেন; যা তিনি নিজেই বিশ্বাস করেন না। বাঙালি মুসলমান সমাজে ধর্মের নামে বিরাজমান এই ভণ্ডামি ও অন্তঃসারশূন্যতাকে লেখক ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন:

"জমিদার সাহেব বধূ লইয়া ফিরিতেছেন- সমস্ত গ্রাম নৌকা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। নৌকা হইতে নামিয়াই হাজী সাহেব উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'ইসলাম কি-' সমবেত জনতা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'জয়'।
বধূ-শূন্য পালকি তাহাতেই ভরিয়া উঠিলো!!" (ফজল, ২০১০: ৬৬)।

লেখকের তীব্র শ্লেষ ও সমালোচনা এই একটি বাক্যের মধ্য দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। লেখক বাঙালি মুসলমান সমাজের এই জরাজীর্ণ দশা থেকে মুক্তি খুঁজেছেন। আর তাই ব্যঙ্গের বাণে এই ধরনের মানসিকতাকে বিদ্ধ করেছেন।

'জনক' আবুল ফজলের আকারের দিক থেকে খুবই ছোট একটি গল্প। আকারে ছোট হলেও গল্পটি ভাবের দিক থেকে খুবই প্রখর। লেখক এ গল্পে ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও অন্তঃসারশূন্যতাকে প্রকাশ করেছেন। সৈয়দ আব্দুল আলিম চৌধুরী একজন বড় ব্যবসায়ী ও জমিদার। তিনি বাইরে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম, কিন্তু ভেতরে তার শঠতা আর ভণ্ডামি। লেখক বিদ্রূপের সুরে বলেছেন:

"তিনি পাক্কা মুসলমান, সুন্নতের বরখেলাপ্ কাজ খুব কমই করেন। তাঁহার চারিটি স্ত্রী" (ফজল, ২০১০: ৬৬)।

এই জমিদার অন্য কোনো সুন্নত পালন করেন বা না করেন বিয়ের ক্ষেত্রে সুন্নত পালনে বদ্ধপরিকর। শুধু তাই নয় ঘরে চারজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য এক দরিদ্র নারীকে তিনি গোপনে বিয়ে করেছেন, গোপনে তার এক পুত্রও আছে। হজে যাওয়ার পূর্বে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মধ্যে সম্পদ বন্টন করার সময় তার গোপনে বিয়ে করা স্ত্রী ফাতেমা ও বালক পুত্র এসে হক দাবি করলে তিনি তাদেরকে অস্বীকার করেছেন এবং প্রাপ্য হক দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। ফাতেমা সমাজ ও আইনের কাছে ন্যায় বিচারের দাবি জানালে সমাজ ও আইন চৌধুরী সাহেবের পক্ষেই রায় দিয়েছেন। দরিদ্র, অসহায় ফাতেমার মত নারী এরূপ পরিস্থিতির শিকার হলে সমাজ-নীতি-আইন অধিকাংশ সময়ই তাদের পক্ষে দাঁড়ায় না; বরং ক্ষমতা-অর্থ-বিত্তের পক্ষেই অবস্থান করে। এক পর্যায়ে চৌধুরী সাহেব বেহেশত লাভের আশায় হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন। যাত্রার সময়ও তার অস্বীকৃত অসহায় স্ত্রী ও পুত্র সাহায্য প্রার্থনা করেছে। কিন্তু তিনি কোনো সাহায্য করেন নি বরং দ্রত বেগে মোটরযানে করে পলায়ন করেছেন। আদালতের অবস্থান ও চৌধুরী সাহেবের এই যাত্রাকে লেখক ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন:

> "স্তম্ভিত আদালত দেখিল, শিশু-সংস্করণে চৌধুরী সাহেবই বটে। ধর্মাবতার কিন্তু রায়ে লিখিলেন 'আইন বে-আইনী পুত্র স্বীকার করে না, মোকদ্দমা ডিসমিস!!'...ভোঁ... মোটর দ্রতবেগে ধাবিত হইল..। স্বর্গ পানে?" (ফজল, ২০১০: ৬৭)।

ধর্মের আড়ালে ভণ্ডামি ও পাপ কর্ম করা, অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতার অপব্যবহার করে আইনকে নিজের পক্ষে ব্যবহার করা, হকদারের প্রাপ্য হক প্রদান না করে কেবল আচারসর্বস্ব ধর্ম পালন করলে স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে না। স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য সবার পূর্বে প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি। আর তাই লেখক তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে বলেছেন জমিদার মোটরযানে চড়ে দ্রত বেগে স্বর্গের দিকে যাত্রা করলেন।

'আক্কেল গুড়ুম' গল্পের মধ্যে তির্যক ব্যঙ্গরস নিহিত রয়েছে। এ গল্পে লেখক বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া বাঙালি জাতির অন্ধ অনুকরণের বিষয়টি তীব্র ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। খুবই সাধারণ একটি ঘটনা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে কল্পকাহিনিতে পরিণত হয়েছে এবং তার দ্বারা গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হয়েছে। গড্ডলিকা প্রবাহে কেবল গ্রামের সাধারণ মানুষ গা ভাসিয়ে দেয় নি, গ্রামের মাথা অর্থাৎ মাতবর, বড় বড় হুজুরও এই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। গল্পটি শুরু হয়েছে এক বুড়োবুড়িকে কেন্দ্র করে। এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার বয়স অজ্ঞাত। কেউ মনে করে একশো বছর, কেউ মনে করে দেড়শ বছর, আবার কেউ মনে করে দুইশ বছর। তবে সঠিকভাবে কেউ জানে না। গ্রামের সব থেকে প্রাচীন এই বুড়ো-বুড়িকে নিয়ে মানুষের মুখে মুখে রচিত হয়েছে কেচ্ছা-কাহিনি। এক পর্যায়ে তারা ফকির-ফকিরনিতে পরিণত হয়েছে। আশেপাশের গ্রাম থেকে মানুষ মানত করে হাঁস, মুরগি, খাসিসহ নানা উপকরণ নিয়ে তাদের কাছে এসেছে। কেউ এসেছে পানি পড়া নিতে, কেউ এসেছে দোয়া তাবিজ নিতে। কোন প্রকার বিচার-বিশ্লেষণ বা চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই তারা এরূপ কাজে নিমগ্ন হয়েছে। প্রকৃত জ্ঞান বা সত্য জানা থাকলে এরূপ কর্ম করা যায় না, না জানলে বা না জানার ভান করলে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এরূপ অনেক কাণ্ড ঘটানো যায়। তাই লেখক তীব্র ব্যঙ্গ সহকারে বলেছেন:

> "জানাই অন্তহীন দুখ
> না জানাই অশেষ সুখ" (ফজল, ২০১০: ৩৩৯)।

বিংশ শতাব্দীতে যেখানে পুরো বিশ্ব ছুটছে জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে সেখানে পূর্ব বাংলার মুসলমান সমাজের বড় একটি অংশ ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও কুসংস্কারে ডুবে রয়েছে। আত্মোন্নয়নের জন্য যে আক্কেল বা বিচারবুদ্ধি ও সচেতনতা প্রয়োজন তার সঙ্গে যেন এদের যোগাযোগ নেই। এই আধা জাগ্রত-আধা নিদ্রিত বাঙালি মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি বার বার কথার বাণে আঘাত করেছেন। যার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এই তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গরসাত্মক ও শ্লেষাত্মক উক্তির মধ্য দিয়ে:

> "আসলে আক্কেলটাই মানুষের যত নষ্টের মূল, সে নষ্টেরই করতে হবে মূলোৎপাটন। পাপ-তাপ-গোনাহ্-বেদাত সবকিছুর গোড়া তো মানুষের আক্কেল। এ আক্কেলের জন্যই মানুষকে বারবার দিতে হয় আক্কেল সেলামি। অতএব সে আক্কেলকেই করতে হবে দুনিয়া ছাড়া। এখন ভাই আক্কেল-মারা কল চাই, আক্কেল মারা কল" (ফজল, ২০১০: ৩৩৭)।

'কুমারী এ-মা' মূলত একটি ব্যঙ্গ রচনা। আবুল ফজল পূর্ব বাংলার তৎকালীন পিছিয়ে পড়া কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোষ্ঠীর জ্ঞান চর্চা ও আধুনিক শিক্ষায় মনোনিবেশ করার পক্ষে থাকলেও আধুনিক শিক্ষার নামে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির পক্ষে ছিলেন না; যার প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। কুমারী এ-মার নারী শিক্ষা ও নারী স্বাধীনতার নামে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করা এবং তার ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। কুমারী এ-মা উচ্চশিক্ষিত এম.এ পাস করা নারী। সমাজের প্রচলিত রীতিনীতির অনেক কিছুতেই তার বিশ্বাস ছিল না। বিয়ে নামক বস্তুর প্রতি তার অঢেল ঘৃণা। আর তাই গল্পের নায়ক তাকে কয়েকবার বিয়ের প্রস্তাব দিলে নায়কের মধ্যে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সে রাজি হয়নি। বরং সে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে এবং উড-বি ব্যারিস্টারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছে। নারীর সম্ভ্রম বা নারীত্বের বিষয়টিকে সে কেবল একটি সামান্য বিষয় হিসেবে দেখেছে। বৈবাহিক স্বীকৃতি ছাড়া উড-বি ব্যারিস্টারের সঙ্গে রাত্রি যাপন করার পর গর্ভধারণ করলে উড-বি ব্যারিস্টার তাকে ও তার সন্তানকে অস্বীকৃতি জানিয়ে ত্যাগ করেছে। তখন কুমারী এ-মা বুঝতে পেরেছে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে, মেয়েদের এর চেয়ে বড় সর্বনাশ হতে পারে না। আর তাই সে যার বিয়ের প্রস্তাবকে এক সময় বারবার প্রত্যাখ্যান করেছিল তারই কাছে ছুটে গেছে সন্তানের অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য। যে কুমারী এ-মা আধুনিক শিক্ষা, নারী স্বাধীনতার নামে সমাজের কোন বিধি নিষেধকেই তোয়াক্কা করেনি, সেও অনাগত সন্তানের পিতৃপরিচয় নিয়ে চিন্তিত এবং মূর্ছা গিয়েছে। কুমারী এ-মার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ও সৃষ্টি হওয়া আপত্তিকর পরিবেশকে লেখক এভাবেই ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন:

"এ-মার অবস্থা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, ওদেশের এমি জনসন, প্যাভলোভার সর্বনাশ তো কেউ করতে পারে না। তারা তো কারও সঙ্গে দেখা করতে এসে এমনিভাবে চোখের জলের পাইপ খুলে দিয়ে বসে না। তোমার এম.এ পাস আত্মরক্ষার বিদ্যেটুকুও শিখায় নি!" (ফজল, ২০১০: ১৮৬)।

'একখানি হাসি' আবুল ফজলের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এ গল্পে লেখক অসচ্ছল, জীবন-যুদ্ধে ক্লান্ত এক স্কুল মাস্টারের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রবীণ শিক্ষক রফিক সাহেবের জীবনের অহংকার যে তিনি গাধা পিটিয়ে মানুষ তৈরি করেন। আর তাই সংসারে আর্থিক সচ্ছলতা না থাকলেও জীবনে শ্রদ্ধার অভাব হবে না বলে তার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই সংসারে দরিদ্র শিক্ষক শ্রদ্ধার নয়, বরং নির্মম পরিহাসের পাত্র। যা গল্পে প্রতীকীরূপে তার ছাত্র মনিরের মুখের এক টুকরো নির্মম হাসির মধ্য দিয়ে লেখক প্রকাশ করেছেন:

"কতদিন বাতি নিবিয়ে শুতেই এই হাসিটি বাঁকা ছোরার মতো তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, এই হাসিটি যেন তার এই ত্রিশ বছরের শিক্ষকতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। ধরা-ছোঁওয়া যায় না- অথচ ভিতরে ভিতরে এই হাসি শতমুখো সুচের মতো বিঁধতে থাকে" (ফজল, ২০১০: ৩৮)।

এই হাসি যেন উপেক্ষা ও করুণাই তাকে ব্যঙ্গ করেছে। প্রবীণ শিক্ষক রফিক সাহেবের শেষ জীবনের সঙ্গী হয়েছে এই ব্যঙ্গাত্মক হাসি। তরুণ শিক্ষক সৈয়দের সঙ্গে তার কথোপকথনের সূত্রে আমরা জানতে পারি তিনি অ্যামবিশন থেকে শিক্ষকতায় এসেছিলেন এদেশের ছেলেমেয়েগুলোকে মানুষ করার জন্য। কিন্তু এদেশে এই অ্যামবিশনের কোনো মূল্য নেই। এই অ্যামবিশনের জন্য কত দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যে যেতে হতে পারে তা এ যুগের ছেলে সৈয়দের জানা। আর তাই সৈয়দ এই চাকরির পাশাপাশি রেলওয়েতে চাকরির দরখস্ত করে রেখেছে। এটি প্রধানত তির্যক ব্যঙ্গরসের গল্প। এদেশের স্কুল শিক্ষকদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনকে তির্যক ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে আলোচ্য গল্পে চিত্রণ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সরিফা সালোয়া ডিনার এই মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে:

"'একখানি হাসি' গল্পের প্রধান অবলম্বন তীর্যক ব্যঙ্গরস।... গল্পটি যথেষ্ট সংহত এবং ছোটগল্পের যথার্থ পরিণামবাহী। লেখকের নিপুণ বর্ণনায় একখানি বঙ্কিম হাসির ট্রাজিক পরিণতি গল্পটিকে প্রাণস্পর্শী করে তুলেছে" (আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য, ২০০৯: ১৭৩)।

'কবিতার কাঁটা' গল্পটি চিঠির আকারে লেখা। তৎকালীন সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে এসে শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অভ্যস্ত মানুষেরও যে মানসিক মুক্তি ঘটে নি তার প্রকাশ ঘটেছে এই গল্পে। তিনি এই ধরনের মানসিকতার অধিকারীদের ব্যঙ্গ করেছেন। গল্পের নায়ক হোস্টেল থেকে বন্ধুর বাসায় এসে উঠেছে বন্ধুর আগ্রহের কারণেই এবং সেখানে পাঁচ বছর অবস্থান করেছে। বন্ধুর মা, বোন অর্থাৎ পরিবারের সকলের সঙ্গে পরিবারের একজন হয়েই মিশেছে। এখান থেকে সে অঢেল মাতৃস্নেহ পেয়েছে এবং বন্ধুর বোনের সঙ্গেও সে বন্ধুর মতোই মিশেছে। তার কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। একবার পরীক্ষা শেষে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসার পর সে দেখে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতদিন সবার সঙ্গে বসে খাওয়ার সুযোগ থাকলেও এখন তার খাবার বাইরের ঘরে চলে আসে। বন্ধুর যে ছোট বোনের সঙ্গে অকৃত্রিম বন্ধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সে এখন আর তার সামনেই আসে না। এর কারণ তার ঘর থেকে তার লেখা কিছু কবিতা পাওয়া গেছে; যেগুলোর বিষয় নারী ও প্রেম। তাই কর্তা মা তাকে খারাপ চরিত্রের একজন মনে করেছে যা কাজের লোকের বয়ানে উদ্ধৃত হয়েছে:

"-তা কি জানি, তুমি ঐ ছবিওয়ালা বইগুলোতে কি সব লিখেছ, কবিতা না টবিতা, সব মাইয়ালোকের কথা, তাই আম্মা বলেছে তুমি খারাপ লোক" (ফজল, ২০১০: ২৯৭)।

বিংশ শতাব্দীতে এসেও কবি ও কবিতা সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণকারী ব্যক্তিদের লেখক ব্যঙ্গ করেছেন। আর তাই তাকে বন্ধুর বোনের বিয়েতে নিমন্ত্রণ জানানো হলে সে চিঠিতে ব্যঙ্গের সুরে লিখেছে:

"কিন্তু আমি জানি, আমার আশীর্বাদ দেয়ালে ধাক্কা খাইয়া ফিরিয়া আসিবে। তুমি হয়তো এইটুকু পড়িয়াই বিদ্রুপের হাসি হাসিতেছ- যে পরের জন্য কবিতা লেখে তাহার আবার আশীর্বাদ!" (ফজল, ২০১০: ২৯৮)।

'নিজের মা ও পরের বাপ' গল্পে লেখক সমাজের শিক্ষিত ধনিক শ্রেণির ভদ্র চেহারাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। বড় বড় খেতাব আর প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যায় না, তার জন্য প্রয়োজন মনুষ্যত্ব। এই গল্পের সদ্য খান সাহেব খেতাবপ্রাপ্ত চৌধুরী সাহেব ড্রয়িংরুম থেকে জানতে পারেন খোকা জলের কুয়াতে পড়ে গেছে। এটি জানার পর যখন তিনি অর্ধপাগল অবস্থায় কুয়ার কাছে গিয়ে মাল-কোঁচা মেরে কুয়ার পানিতে নামার জন্য উদ্যত হয়েছেন তখন তিনি জানতে পারেন তার খোকা নয় ঝিয়ের খোকা জলে পড়ে গেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার বেশভূষা ও অবস্থান পাল্টে গেছে। যার প্রকাশ ঘটেছে লেখকের এই বিদ্রুপাত্মক বক্তব্যের মধ্য দিয়ে:

"'অঃ!' বলে একটা পূর্ণ পরিতৃপ্তির বিশ্বাস, চৌধুরী সাহেবের প্রশস্ত ও সুপুষ্ট বুক থেকে (যে বুকে তিনি আগামী নববর্ষে 'সাহেব' থেকে 'বাহাদুরে' উন্নীত হওয়ার উচ্চাশা পোষণ করছেন) উঠে সুন্দর লাবণ্যময় নাকের দুই সুড়ঙ্গপথে বেরিয়ে গেল। হাত অটোমেটিক কলের মত মুহূর্তে মাল-কোঁচা খুলে ফেলল। তিনি ফের যথারীতি ভদ্রলোক হয়ে দাঁড়ালেন" (ফজল, ২০১০: ১৫৮)।

উচ্চবিত্তের সন্তান কেবল সন্তান, খেটে খাওয়া মানুষের সন্তান সন্তান নয়- চৌধুরী সাহেব যেন এরূপ চিন্তা পোষণ করেন। অথচ সকল প্রাণই মূল্যবান। সমাজে চৌধুরী সাহেবের মত এমন অসংখ্য ভদ্রলোক আছে যাদের মনুষ্যত্বের তীব্র অভাব। চৌধুরী সাহেবদের মত ধনবান খেতাবপ্রাপ্ত ভদ্র মানুষের এই মনুষ্যত্বহীন মানসিকতা ও আচরণকে লেখক এভাবেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন এই গল্পে।

'উচ্চ ও তুচ্ছ' গল্পে মানব জীবনের একটি ব্যতিক্রমী দিকের প্রকাশ ঘটেছে। জীবনের তুচ্ছ একটি বিষয়ের কাছে বৃহৎ একটি বিষয় পরাজিত হয়েছে। এখানে উচ্চ বলতে মনের দিক অর্থাৎ প্রেম-ভালোবাসা-মানবিকতার মতো মহৎ বিষয়গুলোকে বোঝানো হয়েছে; যা মাছের মুড়ো খাওয়ার মতো তুচ্ছ বিষয়ের কাছে পরাজিত হয়েছে। লেখক এই বিষয়কে তীব্র ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র শহরের একজন স্বল্প বেতনভুক্ত কর্মচারী। তার নাম আসগর। চির রুগ্ন স্ত্রীর কারণে সে সংসার জীবনে কখনো শান্তি পাইনি। স্ত্রীর দেখাশোনা, ওষুধপত্র, ডাক্তার প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হিমশিম খেয়েছে সে। ফলে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা একসময় ক্ষয়ে এসেছে তার হৃদয়ে। অসুস্থ স্ত্রীর কারণে সংসারে আর্থিক সঙ্কট লেগেই ছিল। ফলে তার মধ্যে জমে থাকা হতাশা, অপ্রাপ্তির প্রকাশ ঘটেছে মাছের মুড়ো খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের মধ্যে দিয়ে। বাজার থেকে অনেক দরাদরির পর মাছের একটি মাথা সে কিনে এনেছে। কিন্তু বাড়িতে আসার পর কাজের বুয়ার মুখে জানতে পারে তার স্ত্রী মারা গেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদে কিছুটা কাতর হলেও তার মস্তিষ্কে মাছের মুড়োর চিন্তা ক্রিয়াশীল থেকেছে। তাই স্ত্রীর মৃত্যুশোক তার মনোযোগকে মাছের মুড়ো থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। লেখক খুবই সূক্ষ্মতার সাথে পাঠকের সামনে সেই চিত্র তুলে ধরেছেন:

> "চাকরকে দেখেই আসগর উত্তপ্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কি কালা, এখনো এখান থেকে বাজারটা পর্যন্ত সরাস নি।' কালার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর বারান্দা পর্যন্ত এসে স্বাভাবিক কণ্ঠেই ফের বললো, 'ওখানে একটা মুড়ো আছে, দেখিস্।' কথাটা বলে মনের ভেতর সে কিসের জন্য একটা দংশন অনুভব করলে এবং অজানা সংকোচের কালো পর্দা যেন তার চেহারার ওপর ছায়াপাত করল" (ফজল, ২০১০: ১২৭)।

দিনশেষে স্ত্রীর দাফন কাফন সম্পন্ন করে যখন সে ঘরে ফিরেছে তখন প্রতিবেশী তাকে খাবারের নিমন্ত্রণ জানালে তাকে সে রাতে না খাওয়ার কথা জানিয়ে দিয়েছে। পরক্ষণেই সে বাড়ির কাজের লোককে জিজ্ঞাসা করেছে মাছের মুড়োটা সে রান্না করেছে কি না। প্রতিবেশীকে দিয়ে দিয়েছে এবং সেই মুড়ো খাওয়ার জন্যই তাকে ডাকতে এসেছিল- এটা জানার পরে সে রাগান্বিত হয়েছে। সারাদিন স্ত্রীর মৃত্যু শোকে যে ব্যক্তি ভারাক্রান্ত হয় নি বরং মুক্তি অনুভব করেছে, সেই ব্যক্তি রাতে বিছানায় শুয়ে মাছের মুড়োর জন্য কান্না করেছে। আমাদের চতুর্পাশে এমন ব্যতিক্রমধর্মী পাষাণ হৃদয়ের অনেকেই রয়েছে। তাই আসগরের এই কান্নাকে লেখক ব্যঙ্গরসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন:

> "আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে আসগর সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল। আজ সারাদিনের মধ্যে একটুখানি কান্নার সুযোগও সে পাইনি অথবা নিষ্ফল জেনে কাঁদে নি। কিন্তু আশ্চর্য, শুতেই তার দুই চোখ জলে ডুবে গেল, কান্না কিছুতেই সে আর রুখতে পারলো না। এই কান্না কিসের জন্য? দেহের জন্য না মনের জন্য? পত্নীপ্রেমের উচ্চ আবেগে, দশ বছরের জীবনসঙ্গিনীর জন্য, না এক সের এক ছটাক ওজনের নেহাৎ এক তুচ্ছ বস্তুর জন্য। আপনারাই বলুন?" (ফজল, ২০১০: ১২৮-১২৯)।

'তিনবার' গল্পে লেখক হাস্যরস ও কৌতুকের আড়ালে শাস্ত্রের বাঁধন, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করেছেন। ইন্দু ও স্নেহলতা পরস্পরকে ভালোবাসে এবং তারা বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তাদের বিয়েতে সব থেকে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্ণপ্রথা। তাদের একজন কায়স্থ, অন্যজন বৈদ্য। ফলে তাদের বিয়েতে স্নেহলতার বাবার কোনো সম্মতি নেই। আর তাই তারা কোর্টে গিয়ে সিভিল ম্যারেজ করেছে। কিন্তু তারপরও স্নেহলতার বাবা এই বিয়ে মেনে নেয়নি। তার বাবা একজন জাদরেল এডভোকেট হওয়ায় আইনের সমস্ত ফাঁক-ফোকর তার জানা। তার বাবা চেষ্টা করেছে তাদের বিয়ে ভেঙে দেয়ার। ফলে তারা দুজন বাধ্য হয়ে হিন্দু ধর্মমতে আবার বিয়ে করেছে। তার বাবা হিন্দুমতের সামাজিক বিয়েও মেনে নেয়নি। তিনি কোর্টের সাহায্যে তাদের এই বিয়েও ভেঙে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। ফলে তারা এবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম ধর্ম মতে বিয়ে করেছে তৃতীয়বারের মতো। কন্যার ভালোবাসা ও এইরূপ কর্মকাণ্ডকে তিনি বংশের মুখে চুনকালি দেয়া হিসেবে দেখেছেন এবং কন্যার সাথে কোনো সম্পর্ক রাখেন নি। এভাবেই তিনটি বছর কেটেছে। এর মধ্যে স্নেহলতা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। অসুস্থ অবস্থায় বাবা স্নেহলতার সমস্ত ভুল ক্ষমা করে আশীর্বাদ করেছে এবং তার পুত্রকে বুকে টেনে নিয়েছে। নবজন্ম নেওয়া এই শিশু পিতা-কন্যার মধ্যকার সমস্ত দূরত্ব দূর করে অনাবিল ভালোবাসার এক পরিবেশ তৈরি করেছে। গল্পটিতে হিন্দু গোঁড়া সমাজপতিদের অর্থহীন সংস্কারকে ব্যঙ্গ করার পাশাপাশি লেখক উদার অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

আবুল ফজল অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে ছোটগল্পে ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে সমাজের অসঙ্গতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করেছেন; যার মর্মমূলে ছিল সমাজ ও স্বদেশের জন্য মঙ্গলকামনা। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর ছোটগল্পে ব্যঙ্গরসের অন্তরালে থাকা সূক্ষ্ম ও গভীর সমাজদর্শনের স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর নয়টি গল্প আলোচনায় আনা হয়েছে। তাঁর অন্যান্য গল্পেও এ বিষয় অনুসন্ধানযোগ্য।

তথ্যসূত্র

ফজল, আবুল। ২০১০। গল্পসমগ্র। সময় প্রকাশন, ঢাকা।

আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক, শামসুল হোসাইন, ভূঁইয়া ইকবাল ও আবুল মোমেন (সম্পাদিত)। ২০০৯। *মানবতন্ত্রী আবুল ফজল: শতবার্ষিক স্মারকগ্রন্থ*। সময় প্রকাশ, ঢাকা ।

মাহবুব, বোরহান। অক্টোবর ২০১২। 'আবুল ফজলের ছোটগল্প: জীবন ভাবনা' শীর্ষক প্রবন্ধ। *সাহিত্য পত্রিকা*, সিদ্দিকা মাহমুদা (সম্পাদিত), বর্ষ ৫০, সংখ্যা ১।

হোসেন, মোহাম্মদ জাহিদ । অক্টোবর ১৯৮৮ । *'আবুল ফজলের ছোটগল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ*, বর্ষ ৩২, সংখ্যা ০১ ।

বোস, চঞ্চল কুমার। ২০০৯। *বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

ইসলাম, আজহার। ২০২১। *বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য*। অনন্যা, ঢাকা।

The author declares the originality of the paper.
The journal authority is not accountable for any estimations of the author presented in the article.